HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৬ • সংখ্যা ১ • মার্চ ২০০৮
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

ভেতরের পাতায়

পৃষ্ঠা ৭

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগ-সংক্রান্ত সমস্যা এবং টিকা-নীতির প্রভাব

পৃষ্ঠা ১২

রাজবাড়ী এবং মানিকগঞ্জে নিপা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব: ফেব্রুয়ারি ২০০৮

পৃষ্ঠা ১৩

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

হাসপাতালভিত্তিক সার্ভিলেন্স থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে বাংলাদেশে ইনফ্লুয়েঞ্জার উচ্চ হার

মানুষের জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণ সনাক্ত করার জন্য এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী (সার্কুলেটিং) ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রজাতির চরিত্র বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে আমরা বাংলাদেশের ১২টি হাসপাতালে ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স পরিচালনা করেছি। শ্বাসতন্ত্রে তীব্র প্রদাহজনিত অসুস্থ রোগীদেরকে আমরা খুঁজে বেড়িয়েছি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থ রোগী যারা হাসপাতালের বহির্বিভাগ থেকে চিকিৎসাসেবা নিয়েছে তাদের কাছ থেকে মাসে একবার নমুনা সংগ্রহ করেছি। এভাবে ২০০৭ সালের মে এবং ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা মোট ১,০৪৫টি নমুনা সংগ্রহ করেছি যেগুলোর ১১৭টিতে (১১%) ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস পাওয়া গেছে। যেসব নমুনায় ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস পাওয়া গেছে সেগুলোর ৪৬টি (৩৯%) ছিলো ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' এবং ৭১টি (৬১%) ইনফ্লুয়েঞ্জা 'বি' শ্রেণীর। ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' ভাইরাস-সমৃদ্ধ নমুনাসমূহ থেকে 'এইচ১' এবং 'এইচ৩' প্রজাতির ইনফ্লুয়েঞ্জা সনাক্ত করা হয়েছে। তবে কোনো নমুনায় 'এইচ৫' প্রজাতি পাওয়া যায় নি।

১৯১৮-১৯১৯ সালে সংঘটিত ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ২৫-৩০% মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয় এবং

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

প্রায় চার কোটি মানুষ মারা যায় (১,২)। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, এটি ছিলো সম্পূর্ণভাবে এভিয়ান ভাইরাসের মতো যা সরাসরি মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিলো (৩)। অত্যন্ত ক্ষতিকর ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' জীবাণুর একটি প্রজাতি (এইচ৫এন১) ১৯৯৬ সাল থেকে এশিয়া মহাদেশে পাখির মধ্যে সংক্রমণ ঘটিয়ে আসছে (৪)। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশসহ ৬১টি দেশের হাঁস-মুরগীর খামারে এর প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে (৫)। ২০০৮ সালের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪৭টিতে হাঁস-মুরগী অথবা পাখির মধ্যে এইচ৫এন১-এর প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে (৬)। অন্যান্য দেশে এইচ৫এন১ ভাইরাসটি পাখির মধ্যে তার সংক্রমণের সীমা অতিক্রম করে মানুষের মধ্যেও উচ্চ মৃত্যুহারসহ সংক্রমণ ঘটিয়েছে। ২০০৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৩৬৬ জন মানুষের মধ্যে এইচ৫এন১-এর নিশ্চিত সংক্রমণ এবং ২৩২ জন মানুষের মৃত্যুসংবাদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় জানানো হয়েছে।

বেশিরভাগ রোগী ছিলো বাংলাদেশের কিছু প্রতিবেশি দেশসহ এশিয়া মহাদেশের অধিবাসী (৭)। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পরবর্তী বিশ্ব-মহামারীর উদ্ভব হবে এশিয়া মহাদেশ থেকে (৮) এবং সম্প্রতি ছড়ানো এইচ৫এন১ ভাইরাসের বংশগত পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে, এই ভাইরাসটি আরো সহজে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার জন্য এর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হতে পারে (৩)। তবে কীভাবে, কখন এবং কোন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে পরবর্তী বিশ্ব মহামারী দেখা দেবে, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় (৯)।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনসংখ্যা-অধ্যুসিত দেশ এবং কয়েকটি ছোট ছোট দেশ ও দ্বীপরাষ্ট্রের পরেই সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার ঘনত্ব এখানে (১০)। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার উদ্ভব ও বিস্তারের ঝুঁকি এবং এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলার সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য বাংলাদেশ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বিস্তারের ক্ষেত্রেও (প্যানডেমিক) সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম ঝুঁকিবহুল দেশ হিসেবে বিবেচিত (১১)। যেসব দেশে মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ ঘটেছে বাংলাদেশ সেসব দেশের সন্নিকটে অবস্থিত, এবং বাড়ির পিছনের আঙ্গিনা থেকে শুরু করে বড় ধরনের বাণিজ্যিক খামার পর্যন্ত এ-দেশের সর্বত্র হাঁস-মুরগী পালন করা হয়।

বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের কিছু উপাত্ত আমাদের হাতে রয়েছে। ঢাকা শহরের কমলাপুরে আইসিডিডিআর,বি পরিচালিত জনসংখ্যাভিত্তিক ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ১৪%-কে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত দেখা গেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের হার ছিলো ১,০০০ শিশুর মধ্যে বছরে ৮৪.৫ বার। যেসব নমুনার মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রমাণ পাওয়া গেছে সেগুলোর ৫৮% ছিলো ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' (এইচ৩এন২, এইচ১এন১) এবং ৪২% ছিলো ইনফ্লুয়েঞ্জা 'বি' প্রজাতির (১২)। তবে সংগৃহীত উপাত্ত বাংলাদেশের একটি মাত্র শহরের একটি ছোট ভৌগলিক এলাকার পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো।

রোগতত্ত্ব, রোগ-নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর সহযোগিতায় আইসিডিডিআর,বি বাংলাদেশের ৬টি বেসরকারি এবং ৬টি সরকারি হাসপাতালে মানুষের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণের ওপর সার্ভিলেন্স পরিচালনা শুরু করে (চিত্র ১)। সার্ভিলেন্সের উদ্দেশ্য

ছিলো বিচ্ছিন্নভাবে কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীর মধ্যে জীবন-ধ্বংসকারী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সংক্রমণ সনাক্ত করা এবং এর বিচরণ-সংক্রান্ত চরিত্র বিশ্লেষণ করা।

চিত্র ১: যেসব হাসপাতালে ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স পরিচালনা করা হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্রে সেসব হাসপাতালের অবস্থান তুলে ধারা হয়েছে

২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সার্ভিলেন্স শুরু করে একই বছরের সেপ্টেম্বর নাগাদ পর্যায়ক্রমে ১২টি হাসপাতালের সবগুলোকে সার্ভিলেন্সের মধ্যে আনা হয়। সার্ভিলেন্সের চিকিৎসকগণ, যাঁদেরকে ওইসব হাসপাতালে কর্মরতদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয়, শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থ রোগীদের সনাক্ত করার জন্য (৩৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার জ্বর এবং কাশি অথবা গলাব্যাথা এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস বা শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো এমন সব রোগী) প্রতিদিন মেডিসিন এবং শিশু-চিকিৎসা ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। একই এলাকা থেকে ৩ বা ততোধিক রোগী এসেছিলো কি না এবং একজন অসুস্থ হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে অন্যজন আক্রান্ত হয়েছিলো কি না তা সনাক্ত করার জন্য চিকিৎসকগণ নিয়মিতভাবে আগত রোগীদের তালিকা পরীক্ষা করতেন। ৩০ মিনিট পর্যন্ত হাঁটার দুরত্বের মধ্যে বসবাসকারীদেরকে একই এলাকার অধিবাসী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অধিকন্তু, প্রত্যেক মাসে পর পর ২ দিন সার্ভিলেন্স চিকিৎসকগণ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো (জ্বর এবং কাঁশি বা গলা-ব্যাথা) অসুস্থতা নিয়ে বহির্বিভাগে আগত রোগীদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ ২০ জনের কাছ থেকে তাদের গলা ও নাকের সোয়াবের নমুনা সংগ্রহ করেন। এরপর সোয়াব নমুনাগুলো আরআরটি-পিসিআর (রিয়েল টাইম রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ পলিমিরেজ চেইন রিয়াকশন) পদ্ধতিতে পরীক্ষা করার জন্য আইসিডিডিআর,বির ভাইরোলোজি ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়।

২০০৭ সালের মে এবং ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা মোট ১,০৪৫টি নমুনা সংগ্রহ করি, যেগুলোর ১১৭টিতে (১১%) ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস পাওয়া গেছে। গবেষণায় ১৯৫ জনকে তীব্র শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত হিসেবে সনাক্ত করা হয়, তবে একসঙ্গে একই এলাকাভুক্ত কয়েকজন রোগী (ক্লাস্টার) পাওয়া যায় নি। তীব্র শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত ১৪ জন রোগীর নমুনা পরীক্ষা করে তিনজনকে (২১%)

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত পাওয়া গেছে। বাকি ১,০৩১টি (৯৯%) নমুনা সংগ্রহ করা হয় হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো রোগে আক্রান্ত রোগীদের কাছ থেকে। তালিকাভুক্ত রোগীদের ৫৫৮জন (৫৩%) ছিলো পুরুষ। সার্ভিলেন্সে তালিকাভুক্ত ১২ জন হাঁস-মুরগীর খামারে কর্মরত কর্মী (খামার কর্মী) এবং ২০ জন স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর মধ্যে একজন (৮%) খামার কর্মী এবং পাঁচজন (২৫%) স্বাস্থ্যসেবা কর্মী ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত ছিলো। শতকরা ৪৩ জন (৪৪৬/১,০৪৫) জন রোগী তাদের স্ব স্ব বাড়িতে হাঁস-মুরগী লালন-পালন করতো বলে জানিয়েছে। তাদের ৩৬ জন (৮%) ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়েছিলো।

যেসব নমুনায় ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গেছে, সেগুলোর ৪৬টি (৩৯%) ছিলো ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' এবং ৭১টি (৬১%) ছিলো ইনফ্লুয়েঞ্জা 'বি' প্রজাতির। চুয়াল্লিশটি ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ'-সমৃদ্ধ নমুনার হেমাগ্লুটিনিন সাবটাইপিং করে দেখা যায় যে, এগুলোর ২৯টি (৬৬%) ছিলো 'এইচ১' এবং ১৫টি (৩৪%) 'এইচ৩' প্রজাতির। কোনো 'এইচ৫' ভাইরাসের সংক্রমণ সনাক্ত করা যায় নি। সব বয়সের রোগীর মধ্যেই ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ দেখা গেছে; তবে সংক্রমণের হার যুবক-বয়সীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং ২৬-৪০ বছর-বয়সীদের মধ্যে সবচেয়ে কম দেখা গেছে (সারণি ১)।

সারণি ১: বিভিন্ন-বয়সী মানুষের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ

বয়স শ্রেণী	পরীক্ষিত নমুনার সংখ্যা	ইনফ্লুয়েঞ্জা পাওয়া গেছে	ইনফ্লুয়েঞ্জার শতকরা হার
পাঁচ বছরের কম	৪৮৮	৫৩	১১%
৬-১৫ বছর	১২১	১৪	১২%
১৬-২৫ বছর	১৬৬	২৬	১৬%
২৬-৪০ বছর	১৬৩	১২	৭%
৪০ বছরের বেশি	১০৭	১২	১১%
মোট	১,০৪৫	১১৭	১১%

সারাদেশেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সংক্রমণের বিস্তার দেখা গেছে। বছরের শেষ তিন মাসের তুলনায় মে এবং সেপ্টেম্বরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক রোগী সনাক্ত করা হয়েছে (চিত্র ২)।

চিত্র ২: মাসভিত্তিক ইনফ্লুয়েঞ্জা নমুনার হার

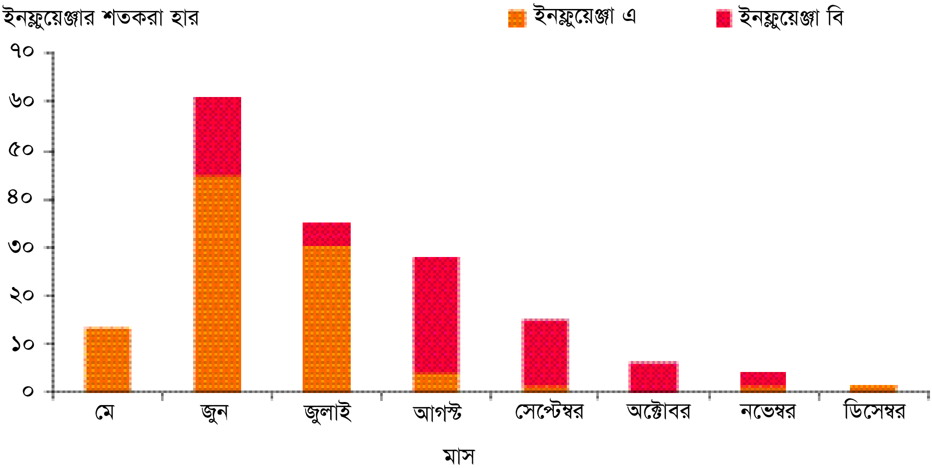

প্রতিবেদন: রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এবং সংক্রামক ব্যধি ও টিকা বিজ্ঞান কর্মসূচি (পিআইডিভিএস), আইসিডিডিআর,বি

অর্থানুকুল্য: স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগ (এইচএইচএস) এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি), আটলান্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মন্তব্য

আমাদের হাসপাতালের বহির্বিভাগে আগত রোগীদের অনেককেই ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত দেখা যায়, বিশেষ করে মে-সেপ্টেম্বরের মধ্যে। যদিও শিশুরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসে, তবে এধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জার হার শিশু ও বয়স্কদের মধ্যে প্রায় একই রকম। বয়স্কদের তুলনায় অধিক হারে শিশুদের হাসপাতালে আসার কারণ সম্ভবত তাদের স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি। এতদসত্ত্বেও, আমাদের গবেষণার উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, সচরাচর বাংলাদেশের সর্বত্রই মৌসূমী-ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ দেখা যায়। ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী নিঃসন্দেহে একটি উদ্বেগের বিষয়। তবে বিগত শতাব্দীতে সর্বব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জার তুলনায় মৌসুমী-ইনফ্লুয়েঞ্জায়ই অধিক মানুষ মারা গেছে (১৩)।

উচ্চহারে হাঁস-মুরগী থেকে ছড়ানো ভাইরাসের সাথে মানুষকে আক্রমণকারী ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং হাঁস-মুরগীর মধ্যে ব্যাপকহারে এইচ৫এন১-এর চলতি মহামারী এদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং মানুষকে আক্রমণকারী ইনফ্লুয়েঞ্জার সংমিশ্রণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে। মানুষের মধ্যে সহজে সংক্রামিত হওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রজাতির উদ্ভব সর্বব্যাপী (প্যানডেমিক) রোগের কারণ সৃষ্টি করতে পারে।

কমলাপুরে জনসংখ্যাভিত্তিক সার্ভিলেন্স থেকে পাওয়া আমাদের গবেষণার প্রাথমিক ফলাফলেও মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের শীর্ষ মৌসুম ছিলো এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (১২)। ইনফ্লুয়েঞ্জার এই মৌসুমী চরিত্র নাতিশীতোষ্ণ এলাকা থেকে ভিন্ন রকমের, যেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জার শীর্ষ মৌসুম হচ্ছে সেপ্টেম্বর এবং মার্চ মাসের মধ্যেকার সময় (১৪)।

আমাদের সার্ভিলেন্স এলাকা ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে এইচ৫এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ অসনাক্ত থেকে যেতে পারে, বিশেষ করে বিচ্ছিন্ন সংক্রমণের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশে অনেক মানুষ চিকিৎসাসেবা নিতে হাসপাতালে আসে না, এমনকি জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকলেও না। এছাড়া আমরা আমাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে তৃতীয় পর্যায়ের (টারশিয়ারী) সব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করি নি। তবে বাংলাদেশে এইচ৫এন১ প্রাদুর্ভাব-সংক্রান্ত খবরের ব্যাপক প্রচার চিকিৎসক এবং প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় কোথাও একই সময়ে কিছু মানুষের মধ্যে (ক্লাস্টার) সংক্রামিত তীব্র শ্বাসতন্ত্রজনিত অসুস্থতা (যা একটি বড় ধরনের জনস্বাস্থ্য সমস্যা) অনির্ণীত থাকার সম্ভাবনা অনেক কম। কোথাও একই সময়ে কিছু মানুষের মধ্যে নির্ণীত এই মারাত্মক রোগের অনুপস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে, উচ্চ সংক্রমণ-ক্ষমতাসম্পন্ন ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বাংলাদেশে ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে সংক্রামিত হচ্ছে না।

চলতি সার্ভিলেন্সের গুরুত্ব অপরিহার্য, বিশেষ করে একই সময়ে কিছু মানুষের মধ্যে তীব্র শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতা নির্ণয়ের জন্য। উচ্চ সংক্রমণ-ক্ষমতাসম্পন্ন ইনফ্লুয়েঞ্জা সনাক্তকরণে সারাদেশের চিকিৎসকগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। নিজ নিজ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং এলাকায় তীব্র শ্বাসতন্ত্রজনিত অসুস্থ কোনো রোগী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণের সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত এবং অসুস্থ বা মৃত কোনো হাঁস-মুরগীর সংস্পর্শে এসে কোথাও একই সময়ে কিছু মানুষ অথবা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে এ-সংক্রান্ত কিছু রোগীর সন্ধান পেলে তাৎক্ষণিকভাবে তা আইইডিসিআরকে জানানো উচিত।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগ-সংক্রান্ত সমস্যা এবং টিকা-নীতির প্রভাব

ঢাকা শহরের একটি স্বল্প-আয়ের জনগোষ্ঠীতে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগের প্রকোপ, সেরোটাইপের প্রকারভেদ এবং রোগের উপসর্গ নির্ণয়ের জন্য আমরা জনসংখ্যাভিত্তিক একটি সার্ভিলেন্স পরিচালনা করি। ২০০৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ৬,১৬৭ জন সন্দেহভাজন শিশুর মধ্য থেকে ৫,৯০৩টি রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা (কালচার) করা হয়। চৌত্রিশজন রোগীর নমুনা থেকে *স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি* সনাক্ত করা হয়। আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগের লক্ষণ নিউমোনিয়া (২৪%), শ্বাসতন্ত্রের উপরের দিকের সংক্রমণ (৬২%) এবং জ্বরজনিত (১৪%) অসুস্থতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। বছরে প্রতি ১০০,০০০ শিশুর মধ্যে সর্বোপরি এবং ১৩-ভ্যালেন্ট টিকা-সম্পর্কিত রোগের হার ছিলো যথাক্রমে ৪৪৭ এবং ২৭৬ বার। পেনিসিলিনের অকার্যকারিতা ছিলো দুই দশমিক নয় শতাংশ। নিউমোকোক্কাল কনজুগেট জাতীয় টিকা বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হতে পারে।

সারা পৃথিবীতে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ নিউমোনিয়া। ২০০০-২০০৩ সালের প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম-বয়সী এক কোটি ছয় লক্ষ মৃত শিশুর ১৯% বা ২০ লক্ষ মারা যায় নিউমোনিয়ায় (১)। *স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি*ও (নিউমোকোক্কাস) শিশুমৃত্যুর একটি কারণ (২)। বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণও নিউমোনিয়া (৩)। ইতোপূর্বেকার গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত প্রোটিন-কনজুগেট টিকা বাংলাদেশে প্রাণঘাতী নিউমোকোক্কাল সেরোটাইপের বিরুদ্ধে কম কার্যকর হতে পারে (৪)। একটি শহুরে এলাকায় পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগের প্রকোপ, রোগের উপসর্গ, সেরোটাইপের প্রকারভেদ, এর মৌসুমী চরিত্র এবং জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এর প্রতিরোধের ধরন নির্ধারণের জন্য আমরা এই গবেষণাটি পরিচালনা করি। এ-গবেষণার বিস্তারিত ফলাফল আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কমিউনিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে (৫)।

গবেষণাটি পরিচালিত হয় ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কমলাপুরে যা আইসিডিডিআর,বির একটি মাঠ এলাকা হিসেবে ১৯৯৮ সাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং সেখানে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য একটি ক্লিনিকও রয়েছে। স্ট্রাটিফাইড ক্লাস্টার নমুনার মাধ্যমে পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের নির্বাচনের জন্য পাঁচ হাজার বাড়ি সার্ভিলেন্সের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনো অসুখের লক্ষণ ছিলো কি না তা জানার জন্য মাঠকর্মীরা তালিকাভুক্ত বাড়িসমূহ পরিদর্শন করেন। এজন্য মানসম্পন্ন একটি প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়। অসুস্থতার লক্ষণসম্বলিত শিশুদেরকে মাঠকর্মীরা আইসিডিডিআর,বির ক্লিনিকে পাঠিয়ে দেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় যেসব শিশু নিউমোনিয়া, মারাত্মক ও বেশি মারাত্মক নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস, অটাইটিস মেডিয়া এবং শ্বাসতন্ত্রের উপরের সংক্রমণে আক্রান্ত বলে মনে হয়েছে তাদের কাছ থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে কালচার করা হয়েছে।

রক্ত কালচারের মাধ্যমে আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগ-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ক্যাপসুলার সোয়েলিং পদ্ধতিতে ঢাকা শিশু হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলোজি ল্যাবরেটরিতে সেরোটাইপের কাজ সম্পাদন করা হয়।

যেসব ভ্যাকসিন বাংলাদেশে চালু করার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে ভ্যাকসিন সেরোটাইপের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যেমন, ১০-ভ্যালেন্ট [গ্লাক্সোস্মিথক্লাইন] (১,৪,৫, ৬বি, ৭এফ, ৯ভি, ১৪, ১৮সি, ১৯এফ এবং ২৩এ), এবং ১৩-ভ্যালেন্ট [ওয়েথ] (১,৩,৪,৫,৬এ, ৬বি, ৭এফ, ৯ভি, ১৪, ১৮সি, ১৯এ, ১৯এফ, এবং ২৩এফ)।

ডিস্ক ডিফিউশন পদ্ধতিতে ওষুধের সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করা হয় (৫) এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণের জন্য গঠিত জাতীয় কমিটিকর্তৃক ওষুধগুলোকে সংবেদনশীল, মোটামুটি সংবেদনশীল (ইন্টারমেডিয়েট) এবং রোগের বিরুদ্ধে অকার্যকর হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।

নিউমোনিয়া অথবা অটাইটিস মেডিয়ায় আক্রান্ত শিশুদেরকে জীবাণুনাশক (এন্টিবায়টিক) ওষুধ দেওয়া হয়। যারা মারাত্মক নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস বা সেপসিসে আক্রান্ত ছিলো তাদেরকে ক্লিনিকে জীবাণুনাশক ওষুধের প্রথম ডোজ দিয়ে হাসপাতালে রেফার করা হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর মেনিনজাইটিসে আক্রান্তদের কাছ থেকে স্নায়ুরসের (সিএসএফ) নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

রোগীরা সুস্থ হওয়ার আগপর্যন্ত গবেষণা-সহকারীগণ প্রত্যহ তাদের বাড়ি পরিদর্শন করেন। পরপর ৭ দিন কোনো রোগীকে রোগমুক্ত থাকতে দেখলে তাকে সুস্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এরপর গবেষণা সহকারীগণ তাদেরকে ক্লিনিকে রেফার করেন, যেখানে প্রকল্প-চিকিৎসক তাদেরকে পরীক্ষা করে রোগমুক্ত হিসেবে প্রমাণ পেলে চিকিৎসা থেকে অব্যাহতি দেন।

২০০৪ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০০৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৬,১৬৭ জন শিশুর রক্তের নমুনা কালচারের জন্য সংগ্রহ করার উপযোগী ছিলো। এদের মধ্যে ৫,৯৪৯ জন তাদের রক্তের নমুনা জমা দেয়, যার মধ্যে ৫,৯৪৬টি নমুনা (৯৬.৪%) সার্থকভাবে কালচার করা হয়। এগুলোর ৩১৫টি (৫%) থেকে জীবাণু সনাক্ত করা হয়, যেগুলোর মধ্যে ৩৪টি (১১%) ছিলো *এস নিউমোনি*। অন্য জীবাণুগুলোর মধ্যে ১৪৪টি (৪৬%) *সালমোনেলা* টাইফি, ২৪টি (৮%) *মোরাক্সেলা ক্যাটারহালিস* এবং ১৩টি ছিলো (৪%) *সালমোনেলা* প্যারাটাইফি। কোনো নমুনায়ই *হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা* পাওয়া যায় নি। নিউমোকোক্কাল জীবাণুসমৃদ্ধ কোনো নমুনায়ই অতিরিক্ত আর কোনো জীবাণু পাওয়া যায় নি।

আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগে আক্রান্ত শিশুদের গড় বয়স ছিলো ১৪.৮ মাস (এমডি ৯.৫); ১৪ জন (৪১%) ছিলো ছেলে এবং ২০ জন (৫৯%) মেয়ে-শিশু। আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগে আক্রান্ত ৩৪ জন শিশুর মধ্যে ১৩ জনকে (৩৮%) তাদের রোগ সনাক্তকরণের পূর্বে জীবাণুনাশক ওষুধসহ বিভিন্ন রকমের ওষুধ দেওয়া হয়েছিলো – একজনকে (৩%) জীবাণুনাশক,

২ জনকে (৬%) অ্যান্টিহিস্টামিন, ১ জনকে (৩%) হোমিওপ্যাথিক এবং ৯ জনকে (২৭%) প্যারাসিটামল।

বছরে ৭,৬০০ জন শিশুকে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রেখে আমরা ৩,৮৪০ জন শিশুকে ডাক্তারী পরীক্ষার মাধমে নিউমোনিয়া রোগী হিসেবে সনাক্ত করেছি, যাদের মধ্যে ৩১৫ জন (৮.২%) মারাত্মক এবং ৬৫ জন (১.৭%) অত্যন্ত মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিলো। নিউমোনিয়ার সর্বোপরি হার ছিলো বছরে প্রতি ১০০,০০০ শিশুর মধ্যে ৫০,৫২৬ বার (প্রতি শিশুর ক্ষেত্রে বছরে ০.৫১ বার)। আটজন ছিলো নিশ্চিত মেনিনজাইটিসের রোগী, আর মেনিনজাইটিসের হার ছিলো বছরে প্রতি ১০০,০০০ শিশুর মধ্যে ১০৫ বার।

আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাসের সর্বোপরি হার ছিলো বছরে প্রতি ১০০,০০০ শিশুর মধ্যে ৪৪৭ বার। বছরে প্রতি ১০০,০০০ শিশুর মধ্যে ১০-ভ্যালেন্টভিত্তিক হার ছিলো ২৬৩ বার এবং ১৩-ভ্যালেন্টভিত্তিক হার ছিলো ২৭৬ বার। বছরের সব সময় আবার আক্রমণের হার একই রকম নয়। আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ-হার ছিলো শূন্যের কোঠায়, অন্যদিকে ফেব্রুয়ারি মাসে এ-হার ছিলো ১,১৫০ বার (চিত্র ১)। এতে দেখা যায় যে, শুকনা এবং অপেক্ষাকৃত শীতের মাসে এ-হার সবচেয়ে বেশি থাকে।

চিত্র ১: আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগের মৌসুমী চরিত্র: কমলাপুর (এপ্রিল ২০০৪-ডিসেম্বর ২০০৬)

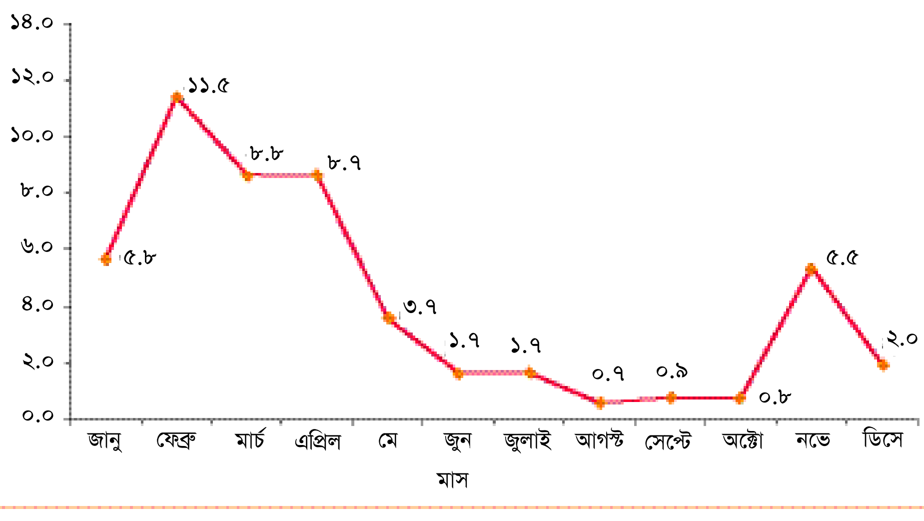

আটজন নিশ্চিত আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল (নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত) রোগীর মধ্যে ৪ জনের অবস্থা ছিলো মারাত্মক অথবা বেশি মারাত্মক। চূড়ান্তভাবে পরীক্ষিত অন্য ৫ জনের মধ্যে ৪ জন ছিলো জ্বরজাতীয় জীবাণুতে আক্রান্ত এবং অন্যজন ছিলো অটাইটিস মেডিয়ায় আক্রান্ত, যা অন্য

একটি শ্বাসতন্ত্রজনিত সংক্রমণ। এভাবে দেখা যায় যে, ৩৪ জন নিউমোকোক্কাল রোগীর মধ্যে ২৯ জন (৮৫.৩%) শ্বাসতন্ত্রজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলো।

অন্যসব প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলের সাথে আলোচ্য গবেষণার ফলাফলের তুলনা করার জন্য এ-ফলাফলকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/আইএমসিআই নির্ধারিত মাপকাঠি অনুযায়ী পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করা হয় (৬)। এ-মাপকাঠি অনুযায়ী দেখা যায় যে, আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগীর মধ্যে নিউমোনিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ২৭ জন (৭৯%) হয়েছে। মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত কোনো রোগীর রক্ত ও স্নায়ুরস থেকে নিউমোকোক্কির জীবাণু সনাক্ত করা যায় নি। আক্রান্ত রোগীদের কেউ মারা যায় নি, যদিও ৫ জন রোগী কিছুটা শারীরিক অক্ষমতা নিয়ে (পুনঃপুন হাঁপানি/রাত্রিকালীন কাশি) আরোগ্য লাভ করেছে।

জীবাণুনাশক-এর কার্যকারিতা পরীক্ষায় সেরোটাইপ ১৪ জীবাণুনাশক পেনিসিলিনে মোটামুটি সংবেদনশীল ছিলো (চিত্র ২)। কোট্রাইমোক্সাজোলের অকার্যকারিতা ছিলো সবচেয়ে বেশি – আটজন নিউমোনিয়া রোগীর মধ্যে ৭ জনের ক্ষেত্রেই এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। ক্লোরামফেনিকলের অকার্যকারিতা ছিলো সবচেয়ে কম। ভ্যাকসিন সেরোটাইপ ১, ১৪, ও ৯ভি-এর ক্ষেত্রে ফ্লোরোকুইনোলোনের অকার্যকারিতাও লক্ষ্য করা গেছে।

চিত্র ২: জীবাণুনাশক ওষুধের অকার্যকারিতা: কমলাপুর (এপ্রিল ২০০৪-মার্চ ২০০৬)

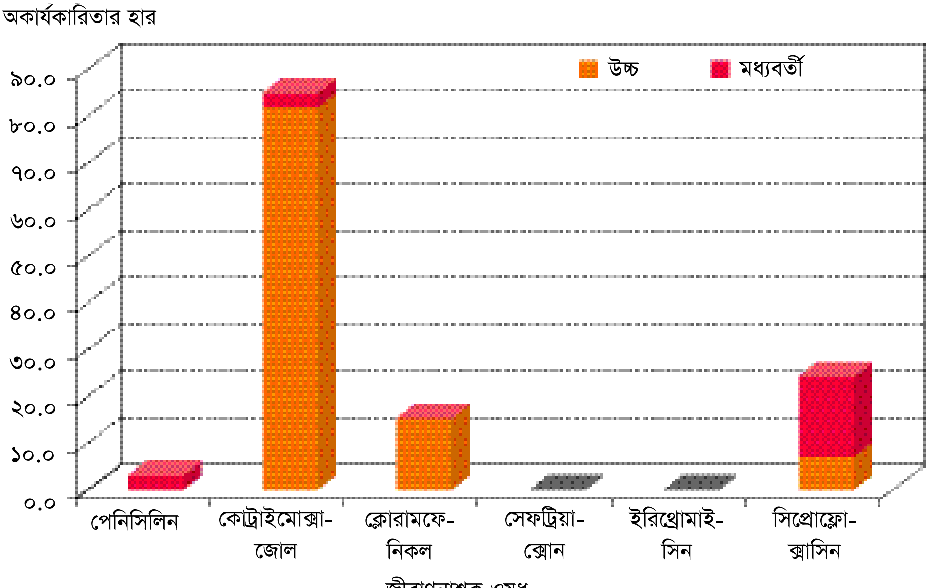

প্রতিবেদক: স্বাস্থ্য পদ্ধতি ও সংক্রামক ব্যধি বিভাগ (এইচএসআইডি), আইসিডিডিআর,বি (সহযোগিতায়: জনস হপকিন্স ব্লুমবার্গ পাবলিক হেলথ স্কুলের হিব ইনিশিয়েটিভ এবং নিউমোএডিআইপি)

অর্থানুকুল্য: গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন অ্যান্ড ইম্মিউনাইজেশন

মন্তব্য

জনসংখ্যাভিত্তিক এই গবেষণায় অ্যাকটিভ সার্ভিলেন্সেকে কাজে লাগানো হয় এবং জ্বরে আক্রান্ত শিশুদের কাছ থেকে রক্তের নমুনা (কালচারের জন্য) সংগ্রহ অব্যহত থাকে। এতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশী শিশুরা আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগের উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, যা থেকে নিউমোনিয়ায় সংক্রমণের ঝুঁকি খুব বেশি। বস্তুত কমলাপুরে মোট আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগের হার এবং ভ্যাকসিন সেরোটাইপনির্ভর আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগের হার গাম্বিয়ার মতো প্রায় একই রকমের ছিলো, যেখানে নিউমোকোক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন নেওয়া শিশুদের মধ্যে মৃত্যুহার প্লেছিবো গ্রহণকারী শিশুদের থেকে ১৬% কম (৭)।

এ-গবেষণা থেকে বোঝা যায়, কীভাবে সার্ভিলেন্স প্রক্রিয়া রোগের লক্ষণের অনুমান-নির্ভরতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। রোগের শ্রেণীবিন্যাসের প্রক্রিয়া কড়াকড়িভাবে আরোপ করে ২৪% রোগীকে নিউমোনিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) ব্যাখ্যা অনুযায়ী (৬) প্রায় ৮০% রোগীকে নিউমোনিয়ার কাতারে ফেলা হয়েছে এবং ২৯% রোগীকে মারাত্মক বা বেশি মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। কড়াকড়িভাবে নিউমোনিয়া শ্রেণীবিন্যাসের প্রক্রিয়া আরোপের পিছনে যুক্তি হলো, ডব্লিউএইচও-র ব্যাপক ব্যাখ্যার আওতায় ভ্যাকসিনের ফলাফলের মাত্রা বেশি দেখানো হতে পারে এবং এতে ভ্যাকসিনের আসল কার্যকারিতা কম অনুমেয় হতে পারে।

শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত বাংলাদেশের অনেক শিশু, বিশেষ করে স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত, কখনো চিকিৎসাসেবা নিতে হাসপাতালে আসেনা (৩)। তাই জনসংখ্যাভিত্তিক সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে নিউমোকোক্কাল রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, সেরোটাইপ এবং জীবাণুনাশক ওষুধের অকার্যকারিতা সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বেশি তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

পেনিসিলিনের বিরুদ্ধে জীবাণুনাশক ওষুধের অকার্যকারিতা কম ছিলো এবং এটি শুধুমাত্র একটি ভ্যাকসিন সেরোটাইপের ক্ষেত্রে দেখা গেছে (সেরোটাইপ ১৪), যা বাংলাদেশে পরিচালিত হাসপাতাল-ভিত্তিক অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের অনুরূপ (৪)। উল্লেখ্য, ফ্লেরোকুইনোলোনের কার্যকারিতা ২০০৫ সালে তিন দশমিক নয় শতাংশ ছিলো এবং ২০০৬ সালে তা বেড়ে ছয় দশমিক নয় শতাংশ হয়েছে এবং মাঝারি ধরনের অকার্যকারিতা শূন্য থেকে বেড়ে ১৭.২% হয়েছে। এটি হতে পারে জ্বর এবং শ্বাসতন্ত্রজনিত অসুস্থতার জন্য ছোট শিশুদেরকে ঘনঘন সিপ্রোফ্লোক্সাসিন দেওয়ার কারণে। একটি কার্যকর নিউমোকোক্কাল ভ্যাকসিন দ্বারা আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত জীবাণুনাশক ওষুধের অকার্যকারিতার হার সামগ্রিকভাবে কমে যেতে পারে (৮)।

এ-গবেষণার সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, এটি বাংলাদেশের একটি শহরের একটিমাত্র ক্ষুদ্র এলাকায় পরিচালিত হয়েছে, সুতরাং এর ফলাফল পুরো দেশের চিত্র তুলে নাও ধরতে পারে। সীমিতসংখ্যক জীবাণু সনাক্ত করার অর্থ হচ্ছে, সচরাচর কম দেখা যায় এমন কোনো বিচরণকারী (সার্কুলেটিং) সেরোটাইপ সনাক্ত করা যায় নি এবং দু'বছর সময়ের মধ্যে সেরোটাইপের পরিবর্তন-সংক্রান্ত তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা যায় নি। তবে এ-গবেষণা থেকে জানা যায় যে, যদি সতর্কভাবে এবং সঠিক পদ্ধতিকে খোঁজা হয় তাহলে আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগ একটি কমন (সচরাচর) রোগ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

বাংলাদেশের এই শহুরে এলাকায় আক্রমণাত্মক নিউমোকোক্কাল রোগ প্রধানত শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতাসম্পর্কিত একটি রোগ, যা নিউমোনিয়া রোগজনিত সমস্যা বাড়ায়। এ-রোগের সংক্রমণের উচ্চ মাত্রা থেকে বোঝা যায় যে, একটি প্রোটিন-কনজুগেট নিউমোকোক্কাল ভ্যাকসিন চালু করার মধ্য দিয়ে নিউমোনিয়াসহ শিশুরোগ এবং রোগসম্পর্কিত জীবাণুনাশক ওষুধের অকার্যকারিতা উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা যেতে পারে।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

রাজবাড়ী এবং মানিকগঞ্জে নিপা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব: ফেব্রুয়ারি ২০০৮

এ-বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মানিকগঞ্জ এবং রাজবাড়ী জেলায় নিপা ভাইরাস এনসেফালাইটিসের দু'টি প্রাদুর্ভাব সনাক্ত করা হয়। নয়জন রোগীর সবাই জ্বরে আক্রান্ত ছিলো এবং তাদের মধ্যে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এদের মধ্যে ৮ জন রোগী মারা যায়। রোগের ঝুঁকির বিষয়গুলো নির্ধারণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এবং আইসিডিডিআর,বি যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা করছে। এসব গবেষণার ফলাফল আগামীতে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তায় প্রকাশিত হবে।

বাংলাদেশের এই এলাকাগুলোতে ২০০১ সাল থেকে এ-পর্যন্ত এটি নিপা ভাইরাসের অষ্টম প্রাদুর্ভাব। প্রাদুর্ভাবসমূহ প্রায় বছরেই জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে হয়েছে এবং দেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম এলাকায় সীমাবদ্ধ রয়েছে। চারটি প্রাদুর্ভাবে ব্যক্তি-থেকে-ব্যক্তিতে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ লক্ষ্য করা গেছে, এবং সম্ভবত বাঁদুড়ের মল, মূত্র ও লালা দ্বারা সংক্রামিত কাঁচা খেজুর-রস পান করার মধ্য দিয়ে ভাইরাসটি বাঁদুড় থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে,

এবং মানুষের মধ্যে সংক্রমণের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এসব গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সরকারের নিপা-প্রতিরোধ বার্তার পরামর্শ হতে পারে, খেজুর-রস মানুষ বা পশু যেই পান করুক না কেন তা ফুটিয়ে পান করা উচিত; বাঁদুড়ের খাওয়া কোনো ফল কোনো মানুষের খাওয়া উচিত নয় এবং পশুকেও খাওয়ানো ঠিক নয়; এবং মারাত্মক রোগে আক্রান্ত (যেকোনো রোগ) রোগীদের সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের রোগীদেরকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত, রোগীদের উচ্ছিষ্ট খাবার খাওয়া উচিত নয়, এবং রোগীদেরকে খাওয়ানো বা পরিষ্কার করার পর সাবান দিয়ে ভালভাবে তাদের হাত পরিষ্কার করা উচিত।

চিকিৎসকগণ কোনো এলাকায় নিপা বা অন্য কোনো মারাত্মক রোগের সন্দেহ পোষণ করলে অনতিবিলম্বে তা স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের নজরে আনা উচিত।

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান (স্বাবি) বার্তার প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাদকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে স্বাবি বার্তা প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যসমূহ প্রতিফলিত হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সম্পর্কে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: মার্চ ২০০৭-ফেব্রুয়ারি ২০০৮

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা = ২১২)	*ভি. কলেরি* ও১ (সংখ্যা = ৭৩৮)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২১.৪	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৯২.৯	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৫১.৯	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৩.৫	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৪.৮	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৪৬.৬
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	১১.১
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা *এবং রোটাভাইরাস-এর তুলনামূলক চিত্র: মার্চ ২০০৭-ফেব্রুয়ারি ২০০৮*

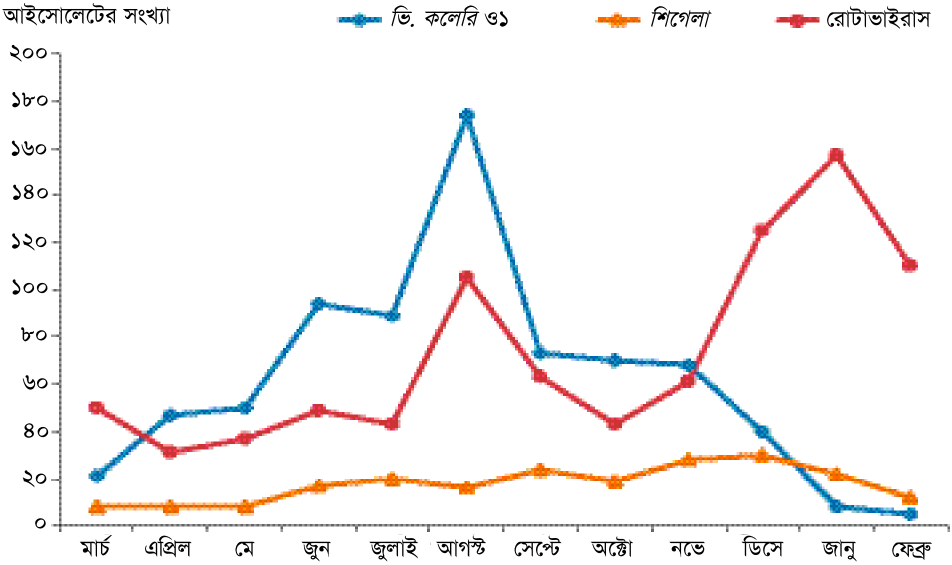

ওষুধের বিরুদ্ধে ১১৯টি এম. টিউবারকিউলোসিস *জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: এপ্রিল-নভেম্বর ২০০৭*

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট
	প্রাইমারি (সংখ্যা=১০৭)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=১২)	(সংখ্যা=১১৯)
স্ট্রেপটোমাইসিন	২৬ (২৪.৩)	০ (০.০)	২৬ (২১.৮)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	১১ (১০.৩)	০ (০.০)	১১ (৯.২)
ইথামবিউটাল	২ (১.৯)	০ (০.০)	২ (১.৭)
রিফামপিসিন	৩ (২.৮)	১ (৮.৩)	৪ (৩.৪)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	২ (১.৯)	০ (০.০)	২ (১.৭)
অন্যান্য ওষুধ	২৭ (২৫.২)	১ (৮.৩)	২৮ (২৩.৫)

() শতকরা হার

* একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭*

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা* সংখ্যা (%)	রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা* সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	১১	১১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	১১	২ (১৮.০)	১ (৯.০)	৮ (৭৩.০)
ক্লোরামফেনিকল	১১	১১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	১১	১১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	১১	১০ (৯১.০)	১ (৯.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	১১	০ (০.০)	০ (০.০)	১১ (১০০.০)
অক্সাসিলিন	১১	১১ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর এবং আইসিডিডিআর,বিকর্তৃক ঢাকার কমলাপুর (শহরাঞ্চল) এবং টাঙ্গাইলের মির্জাপুর (গ্রামীণ) এলাকায় পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের থেকে সংগৃহীত।

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি *জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭*

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৯৮	৪৬ (৪৭.০)	০ (০.০)	৫২ (৫৩.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৯৮	৪৮ (৪৯.০)	০ (০.০)	৫০ (৫১.০)
ক্লোরামফেনিকল	৯৮	৪৮ (৪৯.০)	০ (০.০)	৫০ (৫১.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	৯৮	৯৮ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯৮	৪৪ (৪৫.০)	৫৩ (৫৪.০)	১ (১.০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৯৮	৮ (৮.০)	০ (০.০)	৯০ (৯২.০)

সূত্র: আইসিডিডিআর,বি এবং শিশু হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর।

সার্ভিলেন্স চিকিৎসক রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন।

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), নেদারল্যান্ডস সরকার, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সি (সিডা), সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি লুবি
পিটার থর্প
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

সম্পাদনা বোর্ড:
আব্বাস ভূঁইয়া
এমিলি এস গারলি

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
রাশিদ-উজ-জামান
ডব্লিউ আব্দুল্লাহ ব্রুকস
এমিলি এস গারলি

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বাংলা অনুবাদ:
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম